

ছোট গল্প

মুনাশি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



মুনশি

আচ্ছা দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশিজি এখন কোথায় আছেন।

এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব তার সময়টা বুঝি কাছে এসেছে, তবু হয়তো কিছুদিন সবুর করতে হবে।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।

সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায় যখন স্কুল-পালানে ছেলে ছিল তখন মুনশিজি ছিলেন, ঠিক কত বয়েস, তা বলা শক্ত।

তিনি বুঝি পাগল ছিলেন?

হাঁ, যেমন পাগল আমি।

তুমি আবার পাগল? কী-যে বল তার ঠিক নেই।

তাঁর পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল।

কী রকম শুনি।

যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি।

তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা। কিন্তু, তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে।

মুনশি

দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে। বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম বোধ করে। দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই। মুনশি ছিলেন সেই জাতের মানুষ।

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট করে তাঁর কথা বলো-না, তোমার অর্ধেক কথা আমি বুঝতে পারি নে।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একটু ধৈর্য ধরো।—

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুনশি, দাদাকে ফার্সি পড়াতেন। কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি। হাড় কখানার উপরে একটা চামড়া ছিল লেগে, যেন মোমজামার মতো। দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কখনো জেতে, কখনো হারে। কিন্তু, যে তালিম নিয়ে মুনশির ছিল গুমর তাতে তিনি কখনো কারও কাছে হটেন নি। তাঁর বিদ্যেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কন্ঠি সেটার নজির বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে। যদি হত ফার্সি পড়া বিদ্যে তা হলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজি ছিল লোকে। কিন্তু, ফার্সির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিদ্যে। কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চৈঁচানি কিংবা কাঁদুনির জাতের, পাড়ার লোকে ছুটে আসত বাড়িতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে করে। আমাদের

মুনশি

বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষ্ণু, তিনি কপাল চাপড়িয়ে বলতেন, মুনশিজি আমার রুটি মারলেন দেখছি। বিষ্ণুর এই হতাশ ভাবখানা দেখে মুনশি বিশেষ দুঃখিত হতেন না— একটু মুচকে হাসতেন মাত্র। সবাই বলত, মুনশিজি, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। খোশনামটা মুনশি নিজের পাওনা বলেই টেকে গুঁজতেন। এই তো গেল গান।

আরো একটি বিদ্যে মুনশির দখলে ছিল। তারও সমজদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে সুরেন্দ্র বাঁড়ুজেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিষ্ণুর রুটি বেঁচে গেল, সুরেন্দ্রনাথেরও নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুনশি একটু মুচকে হাসতেন।

কিন্তু, মুনশির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপকর্মের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। কথাটা খুলে বলি। তখন আমরা পড়তুম বেঙ্গল একাডেমিতে, ডিক্‌রুজ সাহেব ছিলেন ইস্কুলের মালিক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশুনা কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিদ্যেও চাই নে, বুদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তবুও তাঁর ইস্কুল থেকে ছুটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিক্‌রুজ সাহেব চোখ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশিকে জানাতুম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। মুনশি মুখ টিপে হাসতেন। হবে না? বাস্‌ রে, তাঁর ইংরেজি ভাষার কী জোর। সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম,

নিশ্চয়! হাইকোর্টের জজের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয় নি।

কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর জাঁক ছিল লাঠি-খেলার কার্দানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্দুর পড়লেই তাঁর খেলা শুরু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনো ছায়াটার পায়ে, কখনো তার ঘাড়ে, কখনো তার মাথায়। আর মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চার দিকে যারা জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, শাবাশ! বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগ্যি। এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি ‘জিতেছি’ তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুনশিজির

জিত রইল। সবাই বলত ‘শাবাশ’, আর মুনশি মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন বুঝতে পারছ, ওর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায়। আমিও ছায়ার সঙ্গে লড়াই করি! সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইকে সত্যি লড়াই বলে বর্ণনা করে।

*

* *

ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের,
সতুর মনটা ছিল নেপোলিয়নের।
ইংরেজ ফৌজের সাথে দ্বার রুধে
দু-বেলা লড়াই হত দুই চোখ মুদে।

ঘোড়া টগ্‌বগ্‌ ছোটে, ধুলা যায় উড়ে,
বাঙালি সৈন্যদল চলে মাঠ জুড়ে।
ইংরেজ দুদাড কোথা দেয় ছুট,
কোন্‌ দূরে মস্‌মস্‌ করে তার বুট।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারে বারে,
দেশে তার জয়রব ওঠে চারি ধারে।
যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্তৃতা
কী যে ইংরেজি ফোটে বলা যায় কি তা।
ক্লাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা,
প্রশ্ন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা।
কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা—
রোজ পেন্সিল তার কেড়ে নেয় গোরা।
খবরের কাগজের ছেঁড়া ছবি কেটে
খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এঁটে।
রোজ তার পাতাগুলি দেখত সে নেড়ে,
ভুদু একদিন সেটা নিয়ে গেল কেড়ে।
কালি দিয়ে গাধা লিখে পিঠে দিয়ে ছাপ
হাততালি দিতে দিতে চ্যাঁচায় প্রতাপ।
বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই,
ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।